সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র • তৃতীয় বর্ষ ৩য় সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০১৬ • পাঁচ টাকা

বিশেষ নিবন্ধ
মহান স্ট্যালিন
পৃষ্ঠা ৩

রুটি-বিস্কুটে ট্যাক্স আরোপ
পৃষ্ঠা ৩

নাসিরনগর ও সাঁওতাল পল্লীতে হামলা
পৃষ্ঠা ৭

পুলিশের হাতে শিক্ষক হত্যা
রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শেষ কোথায়?
শেষ পৃষ্ঠা

কমরেড ফিদেল ক্যাস্ট্রো লাল সালাম

কিউবা বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা কমরেড ফিদেল ক্যাস্ট্রো আর নেই। কিউবা থেকে অনেক দূরে পৃথিবীর আরেক প্রান্তের দেশ, বাংলাদেশের শোষিত মানুষেরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই বীর কমিউনিস্ট নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। কমরেড ফিদেল আমাদের শিখিয়েছিলেন- ছোট হলেও কীভাবে লড়াই করা যায়; শিখিয়েছিলেন– একা হলেও কীভাবে লড়াই করা যায়।

স্প্যানিশ বংশোদ্ভুত এক অভিবাসী পরিবারে জন্মেছিলেন ফিদেল কাস্ট্রো। লড়াকু জীবনের অধিকারী ফিদেল মাত্র ১৩ বছর বয়সে বাবার আখের খামারের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত করেন। আইনজীবী হিসেবে হাভানায় তাঁর পেশাগত জীবন শুরু করার অল্পদিনের মধ্যেই দরিদ্র মক্কেলদের পক্ষে লড়ে সুনাম অর্জন করেন। তাঁর চোখেমুখে সকল সময় ছিলো স্বৈরাচারী শাসকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন। তিনি মনে করতেন, "শোষিত ও নিপীড়িত কোনো দেশে এমনকি মৃতরাও কবরে শান্তি পায় না।"

বিপ্লবপূর্ব কিউবা ছিলো সমস্ত পলাতক ও দাগী অপরাধীদের আড্ডাখানা। কিউবা ছিলো আমেরিকার নোংরামি করার জায়গা, জুয়া-মাদক-ক্যাসিনো ব্যবসার স্থান। ফিদেল ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই হাভানার সকল ক্যাসিনোতে তালা ঝোলানো হয়। জাতীয়করণ করা হয় প্রায় আড়াই হাজার কোটি ডলারের স্থাবর সম্পত্তি, সমস্ত বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কারখানা। কিউবা বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি ছিলো এই যে, এই বিপ্লব কিউবার মানুষকে সম্মান ও মর্যাদা এনে দেবে। সেই বিপ্লবের অব্যাহত বিকাশের ভেতর দিয়ে কিউবা রূপান্তরিত হতে থাকলো এক নতুন দেশ হিসেবে। লোক ঠকানো জুয়ার আড্ডা, মাদক পাচারের সব নেটওয়ার্ক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। পতিতাবৃত্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে বিপ্লবের পরে শতকরা ৯৫ ভাগ পতিতাকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হলো।

বিপ্লবের পর প্রবল অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে পড়ে কিউবা। এমনকি ওষুধপত্র আসাও বন্ধ হয়ে যায়। ভয়াবহ সে অবস্থা কাটিয়ে ওঠে আজ কিউবা তার দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য চিকিৎসা সেবা *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সমাজতন্ত্র পরাজিত হয়নি, শোধনবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পতন হয়েছে

— কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির নেতৃবৃন্দ, সারাদেশ থেকে আগত দলের নেতা-কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ, আমাদের অন্য দুই নেতা বিভিন্ন দিক থেকে দেশের সমস্যাগুলির ওপর আলোচনা করেছেন। আমি তার আর পুনরাবৃত্তি করবো না। কমরেড শিবদাস ঘোষ, যার চিন্তাধারার ভিত্তিতে দল গড়ে তোলার সংগ্রাম আমরা করছি, তিনি বিভিন্ন বক্তব্যে দেখিয়েছেন, কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভুল রাজনীতির চর্চা করতে করতে, আপোষকামী রাজনীতির চর্চা করতে করতে, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ বিপথগামী হয়ে গেলো। এ বিষয়গুলো তিনি মার্কসবাদী বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কেটে কেটে ব্যাখ্যা করে একেবারে স্পষ্ট দেখিয়েছেন। মনে রাখবেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার কথা বলছি মানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এভাবেই বলছি। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আলাদা কিছু নয়, মার্কসবাদ-লেনিবাদেরই উন্নত ও সঠিক উপলব্ধি।

এক নতুন সভ্যতা নির্মাণকারী সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপথগামী হওয়াটাকে তিনি কোনো একটা বিশেষ অবজারভেশনের মাধ্যমে দেখাননি। অনেকগুলো দিকই তিনি তুলে ধরেছিলেন। আমি আজকের বক্তব্যে এর যতটুকু পারি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

আপনারা জানেন আমি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ। তার উপর এতক্ষণ ধরে বসেছিলাম বলে আমি খুবই ক্লান্ত বোধ করছি। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অল্প অল্প করে কর্মী-সংগঠকরা এসেছেন বক্তব্য শুনতে, তাদের হয়তো পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারবো না। যাই হোক আমি চেষ্টা করবো।

শুরুতেই বলে রাখি, যে সকল বন্ধুরা আমার সামনে বসে আছেন তাদের অনেক ইতিহাসই জানা থাকার কথা নয়। সেসব অনেক আগের কথা এবং সেগুলো নিয়ে আলোচনাও হয় কম। সে কারণে তারা বুঝতে পারেন না যে, এতবড় একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ, বিরাট বিশাল শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে যে দাঁড়িয়েছিলো, কীভাবে তার পতন ঘটে গেলো। কোনো বাইরের শক্তি এসে একে ধ্বংস করে দেয়নি, তারা নিজেরাই, ভেতর থেকেই সমাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে দিলো। কীভাবে সে ভেতর থেকে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল, কী কী ঘটনায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছিল, সেসকল বিষয়গুলো কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষিতটার দিকে যদি তাকাই তবে দেখবো, বিপ্লবের আগে ইউরোপের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশ ছিলো রাশিয়া। বিপ্লবের পরেও তার স্থিতিশীল হতে অনেক সময় লেগেছে। ১৯১৭ সালে বিপ্লব হয়েছিলো। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলেছে। দেশের ভেতরের পরাজিত জমিদার-পুঁজিপতিশ্রেণী আবার দেশের বাইরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের আক্রমণের মুখে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। অথচ বিপ্লবের পর এই রাষ্ট্রই এমন সব অধিকার মানুষকে দিয়েছিলো, যা তখনকার সময়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশও কল্পনা করতে পারতো না, এখনও পারে না। রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব সমস্ত সক্ষম যুবক-যুবতীদেরকে কাজ দেয়া, সোভিয়েত *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশে জনতার ঢল
দাবি না মানলে ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল

বিস্তারিত খবর ভেতরের পাতায়

নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ান

মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নতুন করে সেনা অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় তারা পালিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে। এবারের ঘটনার সূত্রপাত হয় গত ৯ অক্টোবর মংডু এলাকায় ৩টি সীমান্ত চৌকিতে সশস্ত্র হামলায় ৯ পুলিশ সদস্য খুন ও অস্ত্র লুটের ঘটনার মধ্য দিয়ে। মিয়ানমার সরকার এ হামলার জন্য দায়ী করেছে রোহিঙ্গা মুসলিম জঙ্গীগোষ্ঠীকে। ঘটনার পর থেকে সন্দেহভাজন জঙ্গীদের ধরার জন্য সেনাবাহিনী ও পুলিশ রোহিঙ্গা এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। তল্লাশির নামে শত শত বাড়ীঘরে আগুন দেয়া হয়েছে, অন্তত ৩০ হাজার রোহিঙ্গা গৃহহারা হয়েছে, নিহত হয়েছে শতাধিক। সর্বশেষ ২০১২ সালে রাখাইন রাজ্যের রাজধানী সিতওয়েতে রোহিঙ্গা মুসলিম ও রাখাইন বৌদ্ধদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উভয়পক্ষে দেড় শতাধিক নিহত হয়েছিল, প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার রোহিঙ্গাকে ঘরবাড়ি ও জমি থেকে উচ্ছেদ করে আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছে। সেবার ঘটনার সূত্রপাত হয় একজন বার্মিজ নারীকে গণধর্ষণ ও খুনের পর। রাখাইনরা এজন্য রোহিঙ্গাদের দায়ী করে এবং উত্তেজিত জনতা বাস থেকে নামিয়ে ১০ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এর প্রতিক্রিয়ায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যায়। ওই ঘটনার পর রোহিঙ্গাদের ওপর আরো বেশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নেমে আসে। তখনও হাজারে হাজারে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। এর আগে ১৯৭৮, ১৯৯১ সালে বড় আকারে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে লাখে লাখে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।

'রাষ্ট্রহীন' নিপীড়িত এই রোহিঙ্গাদের দুর্দশার যেন শেষ নেই। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের বাঙালী অভিবাসী মনে করে। সে কারণে তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। ১৯৮২ সালে প্রণীত *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আদর্শগত সংগ্রামের দুর্বলতা ও চেতনার নিম্নমান শোধনবাদের জমিন তৈরি করেছে

(১ম পৃষ্ঠার পর) রাষ্ট্র তা দিয়েছিলো। এমন একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তারা প্রবর্তন করেছিলো, যে ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচিত প্রতিধিদের 'কল ব্যাক' করতে পারে। এর মানে হলো, যাকে জনগণ নির্বাচিত করলো, সে যদি তাদের আশানুরূপ কাজ না করে তবে জনগণ তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ ঐ প্রতিষ্ঠানে তার সদস্যপদ বাতিল করে দিতে পারে। এই 'রাইট টু রিকল' সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া জনগণকে দিয়েছিলো। এই অধিকারটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সূচনা থেকে আজ অবধি কোনো পুঁজিবাদী দেশ জনগণকে দিতে পারেনি। আবার দিতে যে পারে না তা নয়। ধরুন, আমাদের দেশে সরকার 'কল ব্যাক' করার অধিকার দিয়ে আইন পাশ করলো। তাতে কি জনগণ এই অধিকার চাইলেই প্রয়োগ করতে পারবে? পারবে না। কারণ আমাদের দেশের মানুষ অসংগঠিত। বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে সাধারণ মানুষ অবস্থান করে। অসংগঠিত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জনগণ প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে চাইলেও 'কল ব্যাক' করতে পারে না। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি সংগঠিত সমাজ। সেখানে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে সংগঠিত। যিনি নির্বাচনে দাঁড়ান তিনিও সেই সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই দাঁড়ান। এই সংগঠিত নির্বাচকরা চাইলেই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 'কল ব্যাক' করতে পারে, যে অধিকার আমাদের দিলেও আমরা তার চর্চা করতে পারবো না।

আমি সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় গণতন্ত্রের কতবড় উন্নত রূপ প্রকাশ পেয়েছিলো তা দেখানোর জন্য এই একটা উদাহরণ দিলাম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলো। রাশিয়ায় বিপুল খনিজ সম্পদ ছিলো এবং তা উত্তোলনের মাধ্যমে দেশকে দ্রুত শিল্পোন্নত করে গড়ে তোলার জন্য তাদের মধ্যে প্রবল প্রচেষ্টা সৃষ্টি হয়েছিলো। কয়লা, লোহাসহ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ সর্বোচ্চ উত্তোলন করে এমন একটা অবস্থা তারা তৈরি করেছিলো যে, দুনিয়ার আর কোনো দেশ তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার মতো ছিলো না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় স্তাখানভ নামে এক শ্রমিক কয়লা উত্তোলনের উন্নত কৌশল উদ্ভাবন করে ও রেকর্ড সংখ্যক উৎপাদন করে তাক লাগিয়ে দেয়। এরপর দেশে এক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কে কাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এই আন্দোলনে। এটি 'স্তাখানোভাইট মুভমেন্ট' নামে খ্যাত। কয়লা খনির শ্রমিকরা এটি শুরু করলেও এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সবগুলো ক্ষেত্রেই তা ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করে।

দেশের নারীদের বড় হয়ে ওঠার সমস্ত পথ তারা খুলে দিয়েছিলো। স্বাধীন মানুষ হিসেবে তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলো। মেয়েরা তখন ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়ে সব রকম কাজে অংশগ্রহণ করতে পারতো। মেয়েদের মধ্য থেকে হাজার হাজার ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ লোক তৈরি হয়েছিলো।

তখনকার সময়ের একটা ঘটনা বললে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বলীয়ান এই জাতির তেজ ও শৌর্য্যের একটা দিক বোঝা যাবে। প্রথমদিকে যখন তাদের একবারে অনুন্নত অবস্থা, তখন তারা একটা অটোমোবাইল কারখানা তৈরির পরিকল্পনা করলো। যখন পরিকল্পনা করলো, তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারখানা তৈরিরই পরিকল্পনা করলো। আমেরিকা, জার্মানী ইত্যাদি দেশ থেকে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ার সোভিয়েতে এসেছিলো বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করতে। তারা শুনে তো হেসেই অস্থির। এ তাদের কাছে কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথাই নয়। তারা বললো, 'তোমরা অনভিজ্ঞ, অদক্ষ একদল লোক। বিশ বছরের দক্ষতা তোমরা এক বছরে অর্জন করতে চাও, এ কি করে সম্ভব?' সোভিয়েত শ্রমিকরা এর জবাবে শুধু বলত, 'আমাদের তো করতেই হবে। না করে কোনো উপায় নেই। আমাদের পারতেই হবে। বেশি সময় তো আমরা নিতে পারবো না। আমাদের নিজেদেরকে দ্রুত প্রস্তুত করতে হবে। বিরাট বিপদ আমাদের সামনে আসছে। সেই বিপদ মোকাবেলায় আমাদের তৈরি থাকতে হবে।' একথায় বোঝা যায়, বিশ্বের একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রকে রক্ষা করা ও দ্রুত উন্নত করে তুলে গোটা বিশ্বের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরাট দায়িত্ববোধে কী রকমভাবে উজ্জীবিত ছিলো রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী। তাই তারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে চার বছরেই সমাপ্ত করতে পেরেছিলো। শুধু শিল্প নয়, কৃষি উৎপাদনেও তারা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলো। একর প্রতি গম উৎপাদনে, বীট উৎপাদনে তাদের একজন আরেকজনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।

এরকম অবাক করার মতো প্রচুর কথা আছে। এসব নিয়ে অনেক বইও বেরিয়েছে। আমি আর এ ব্যাপারে কথা বাড়াচ্ছি না। এ বিরাট সমাজতান্ত্রিক উন্নতি ঘটেছিলো কমরেড স্ট্যালিনের সময়ে। স্ট্যালিন, লেনিনের ছাত্র হিসেবে, লেনিনবাদই যে আজকের দিনের মার্কসবাদ এটা দেখান এবং মার্কসবাদকে সমস্ত রকম বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেন। সেদিন স্ট্যালিনকে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যেমন লড়তে হয়েছে, তেমনি দলের ভেতরে ট্রটস্কিদের মার্কসবাদ সম্পর্কিত ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। তিনি তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তি জার্মানীর দ্বারা আক্রান্ত হলো। জার্মানীর আক্রমণে সোভিয়েত প্রথমে খানিকটা পিছিয়ে আসলেও পরবর্তীতে তাকে এমনভাবে মোকাবেলা করলো যে জার্মান সৈন্যদের একবারে বার্লিন পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলো। এই বিরাট জয় পৃথিবীর দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনকে নতুন শক্তি দিলো। উপনিবেশিক শাসন হতে বিভিন্ন দেশ মুক্ত হওয়া শুরু করলো। পূর্ব ইউরোপের পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরিসহ অনেকগুলো দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর চীন তার ৭০ কোটি মানুষ নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ দিলো। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে এরপর যুক্ত হলো লাওস, কম্বোডিয়া, মঙ্গোলিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ। অর্থাৎ বিশ্বের এক বিরাট ভূ-খণ্ড জুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন এই বিরাট সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বকারী দেশ। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে সে তখন আর একা নয়, তার পেছনে তখন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ।

এখন প্রশ্ন আসে এতবড় শক্তিশালী এই সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের কারণ কী? বিশাল লড়াই সংগ্রামের ঐতিহ্য বহনকারী এই গোটা সমাজতান্ত্রিক শিবির এই পরিণতি কেন বরণ করলো? একথা বুঝতে হলে আপনাদের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্যবাদী শিবিরের যখন বিরাট জয় জয়কার, তখনও তাদের মধ্যে আদর্শগত ও চিন্তার ঐক্যের ভিত্তিতে দৃঢ় সংহতির অনেক ঘাটতি ছিলো। বিশেষ করে যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মার্শাল টিটোর উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তার কারণে তাকে কমিনফর্ম থেকে বহিষ্কার করার সময়ই বোঝা গেলো যে, কমিউনিস্ট পার্টিগুলি যখন পরস্পরের সাথে বিভিন্ন সময় মিলিত হতো, তখন নিজেদের মধ্যে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিপ্লবের সাধারণ লাইন গড়ে তোলার যে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি, সেটা অনুসরণ করতো না। ফলে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের বিরাট জয়ের সময়েও নেতৃবৃন্দের চিন্তাপদ্ধতি যান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। বিশেষত সাম্যবাদী শিবিরের দীর্ঘ সাহচর্য ও বহু সংগ্রামের ইতিহাস সৃষ্টিকারী যুগোশ্লাভিয়ার পার্টির পরিণতি তাই প্রমাণ করে। কমিনফর্ম থেকে মার্শাল টিটোকে বহিষ্কার করার অব্যবহিত পরে কমরেড শিবদাস ঘোষ 'সাম্যবাদী শিবিরের আত্মসমালোচনা' রচনায় এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তাঁর সেই লেখায় তিনি বলেন যে, "আমরা যে বিষয়টির প্রতি সমস্ত কমিউনিস্টদের বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তা হচ্ছে, সোভিয়েত বা কমিনফর্ম নেতৃত্বের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ঐ নেতৃত্বকে দুর্বল করতেই সাহায্য করবে। আমাদের হাতে রয়েছে বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, আমাদের সম্পদ হচ্ছে দ্বন্দ্বতত্ত্বের মার্কসীয় বিজ্ঞান যার মানদণ্ডে আমাদের অবশ্যই নেতৃত্বকেও বিচার করে নিতে হবে- তা সে সোভিয়েত নেতৃত্বই হোক বা কমিনফর্ম নেতৃত্বই হোক। একথা ক্ষণিকের জন্য ভুললে চলবে না যে, প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টির নিজস্ব উদ্যোগই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠনের সক্রিয়তা ও কার্যকারিতার সুদৃঢ় ভিত্তি। চোখ বুঁজে নেতৃত্বকে শুধু অন্ধ সমর্থন জানিয়ে গেলে কোনও নেতৃত্বের পক্ষেই বিশ্বপরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা ও সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

এমনকি সেই লেখায় তিনি এই বলেও হুশিয়ারি দেন যে, "...মতাদর্শগত ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অমার্কসীয় যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা রয়েছে, তা যদি সময়মতো ঠিকভাবে সমাধান করা না হয়, তাহলে বিশ্ব ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না যখন মানুষ দেখবে যে, বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরও কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যকে আরও সুদৃঢ় করা ও বিশ্বসাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি দ্বন্দ্ব-কলহে ও এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহেও লিপ্ত হয়ে পড়েছে।"

কমরেড শিবদাষ ঘোষের এই আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়, যখন পরবর্তীতে দেখা যায় যে, সমাজতান্ত্রিক চীন ও সমাজতান্ত্রিক ভিয়েতনাম পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে যে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার, তিনি এই কথাগুলো যখন বলেছেন তখন ১৯৪৮ সাল। সে সময়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শক্তি ছিলো প্রশ্নাতীত। তখন কিছু সমস্যা ছিলো কিন্তু এরকম কিছু ঘটবে তা কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। অসাধারণ প্রজ্ঞার সাথে তিনি সেই বিপদটি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে কেটে যায়নি। এই যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির কারণে চেতনার যে নিম্নমান সৃষ্টি হলো সোভিয়েত পার্টিও এর বাইরে বেরুতে পারলো না। অর্থাৎ শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের পরস্পরের ক্ষেত্রে নয়, বিভিন্ন পার্টির অভ্যন্তরে, এমনকি সোভিয়েত পার্টির অভ্যন্তরে এই যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ছিলো এবং তা চেতনার নিম্নমানের জন্য দায়ী। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যতিরেকে চেতনার মান উন্নত হতে পারে না। স্ট্যালিনের নেতৃত্বের সময়েও চেতনার নিম্নমানের কারণে অনেক ভুল হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির মূল জায়গাটায় তা আঘাত করতে পারেনি। কিন্তু সেই নেতৃত্বের অনুপস্থিতির পর চেতনার নিম্নমানের ফলে সেই মূল জায়গাটা ঘা খেলো এবং সংশোধনবাদী রাজনীতির প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো। এটা বাড়তে বাড়তে এক সময় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে পতনের দিকে নিয়ে গেলো।

স্ট্যালিন এ ব্যাপারে ঊনবিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন,"বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অবশেষ আজও আমাদের দেশে আছে। ব্যক্তিসম্পত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নৈতিকবোধ ও মানসিকতার ধ্বংসাবশেষ আজও টিকে আছে। এটি কখনও আপনা আপনিই শেষ হয়ে যাবে না; এগুলির টিকে থাকার ক্ষমতা খুব বেশি এবং এরা নিজেদের প্রভাব শক্তিশালী করতে পারে। তাই এগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। আবার বাইরের পুঁজিবাদী দেশগুলি এবং আমাদের দেশের ভেতরের সোভিয়েত রাষ্ট্রবিরোধী গ্রুপগুলির অবশিষ্টাংশ- যা সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা যায়নি- এই উভয় শক্তি থেকে সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা, ভাবনাধারণা এবং মানসিকতা সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশ করবে না এমন গ্যারান্টিও আমাদের কাছে নেই। একথাও ভুলে যাওয়া চলে না যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুরা আমাদের সমাজের দুর্বল মানুষদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর চিন্তা প্রবেশ করাতে, সেগুলি উস্কে দিতে ও তাতে মদত দিয়ে বাড়িয়ে দিতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিছু পার্টি সংগঠন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তাদের সকল দৃষ্টি আবদ্ধ করে ফেলেছে, আদর্শগত সংগ্রাম ভুলে যাচ্ছে, তার চর্চা পিছনে ঠেলে দিচ্ছে। এমনকি মস্কো সংগঠনের মতো পার্টি সংগঠনেও মতাদর্শ চর্চার দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এই অবহেলা অবাধে চলতে দেয়া যায় না। যখনই মতাদর্শ চর্চার শৈথিল্য ঘটছে, তখনই সমাজতন্ত্রবিরোধী চিন্তা ও ভাবধারার পুনরুত্থানের উর্বর জমি তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোন একটি জায়গাতেও যদি আদর্শগত চর্চার দিকটি কোন কারণে পার্টি সংগঠনের নজরের বাইরে থেকে যায়; কোন একটা ক্ষেত্রেও যদি পার্টির নেতৃত্ব ও প্রভাব দুর্বল হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রগুলিকেই, সমাজতন্ত্রের শত্রুরা, লেনিনবাদবিরোধী দুষ্টচক্রের অবশিষ্টাংশ, যারা এখনও রয়েছে, তারা দখল করবে এবং নিজেদের রাজনৈতিক লাইন চালু করার জন্য তা ব্যবহার করবে, সবরকম অমার্কসীয় 'চিন্তা' ও 'ধারণা' পুনরুজ্জীবিত করার ও ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তাকে কাজে লাগাবে।" কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রুশ্চেভ এসে দলের ভেতরে সেই আদর্শগত সংগ্রাম জোরদার করার কাজতো করলেনই না বরং ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নাম করে স্ট্যালিনকেই কালিমালিপ্ত করা শুরু করলেন। এর ফলে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঠিক উপলব্ধিরই গণ্ডগোল করে দিলেন। সাথে সাথে ক্রুশ্চেভ পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 'ব্যক্তিগত ইনসেনটিভ' দেয়া শুরু করলেন। এরকম অনেক ভুল নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করেছেন এবং বাস্তবিকপক্ষে এই ভুলগুলো করতে করতে একসময় সোভিয়েত পার্টিটি পুরোপুরি সংশোধনবাদী লাইনে চলে গেলো। এইরকম কয়েকটি ঘটনা নিয়ে আমি আজ আলোচনা করবো, তাতে আমাদের এই কমরেডরা ঘটনা ধরে ধরে সমস্যাটা বুঝতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বপুঁজিবাদের বাজার সংকট আরও তীব্র হলো। কারণ পৃথিবীর এক বিরাট জায়গা জুড়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে পুঁজিবাদী বাজার অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়লো। তার উপরে নতুন নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো, যাদের 'রিসার্জেন্ট ন্যাশনালিস্ট' দেশ বলা হতো, তারা আবার নতুন প্রতিযোগী হিসেবে পুঁজিবাদী বাজারে প্রবেশ করলো। এ পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে একটি নতুন উপসর্গ দেখা গেলো। সেটা হলো অর্থনীতির সামরিকীকরণের ঝোঁক। এর সুবিধা হলো পুঁজির মালিককে বাজার খুঁজতে হয় না। রাষ্ট্রই অস্ত্র উৎপাদনের অর্ডার দেয়, মালামাল সে নিজেই কেনে। এই বিরাট কারখানা চালু রাখতে ও তার জন্য যে সহযোগী প্রতিষ্ঠান দরকার হয়, তাদের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি একরকম গতিশীল থাকে। কিন্তু এর আরেকদিকে সমস্যা আছে। তা হলো, রাষ্ট্র অস্ত্র কিনে তো আর শুধু শুধু জমিয়ে রাখতে পারে না। তাকে এগুলো খালাস করতে হবে। তবেই সে আরও নতুন অস্ত্রের অর্ডার দিতে পারবে। এর জন্য যুদ্ধ তার খুব দরকার। বিশ্বযুদ্ধ লাগাবার মতো বাস্তবতা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আংশিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধ তাকে লাগিয়ে রাখতে হবে। সেটা অন্য সবার চেয়ে বেশি দরকার আমেরিকার। কারণ *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

মহান স্ট্যালিন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

এক কঠিন সময়ে স্ট্যালিন তাঁর পূর্ণ মহত্ত্ব নিয়ে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন- আমরা তাঁকে দেখেছি সমগ্র বিশ্বজুড়ে প্রগতির রাজপথে সগর্বে পদচারণা করতে। তাঁর আপন জন্মভূমি গুর্জির পাহাড়ী পথ তিনি লঙ্ঘন করে চলেছেন, ডন আর ভল্গার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন তিনি অতিক্রম করছেন, মস্কোর নির্মীয়মান সুবিশাল সড়কে তাঁর দৃপ্ত পদক্ষেপ, জনকোলাহলে পূর্ণ সাংহাইয়ের বাজারে তাঁর উপস্থিতি, ফ্রান্সের পাহাড়ী উপত্যকায় তিনি হাঁটছেন। ব্রাজিলের রণ ভূমিতে তাঁর পদচিহ্ন, রোমের বিশাল প্রাঙ্গনে তাঁর দীর্ঘতম ছায়া, ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রামে তিনি বিচরণ করেছেন- পর্বত-শিখরকে তিনি মাপছেন তাঁর পদচিহ্নে।

স্ট্যালিনের শেষকৃত্যের সময় যখন এসেছে, তখন প্যারিসের এক বেকার যুবক, গোলাপ ফুলের মালায় সজ্জিত তাঁর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে একগুচ্ছ ভায়োলেট ফুল নিবেদন করল তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে- 'আজ আমি রুটি না কিনে সে পয়সায় ওঁর জন্য ফুল কিনলাম।' তুরিনের সমস্ত কলকারখানা স্তব্ধ হয়েছিল, সিসিলিয় কৃষিশ্রমিকেরা নিশ্চুপ নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান ছিল, জেনোয়ার বন্দর শ্রমিকেরা বন্ধ করে দিয়েছিল তাদের সমস্ত কাজকর্ম। সবাই যেন স্ট্যালিনের শবযাত্রার যাত্রী। পুরনো পিকিঙে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জড়ো হচ্ছিল শহরের সীমানা ছাড়িয়ে বিশাল ময়দানপ্রান্তে, তাদের পরম সুহৃদের জন্য শোক প্রকাশ করতে। আর্জেন্টিনার চারণভূমিতে এক গাড়োয়ান পথ চলতে চলতে 'শোক' শব্দটি উচ্চারণ করে থমকে দাঁড়াল আর সেই মুর্হূতে সে ও তার গাড়ীর যাত্রী উভয়ে স্ট্যালিনের জন্য শোক ব্যক্ত করল। কোরিয়ার ভগ্নস্তুপের মধ্যে সেই সব মায়েরা যারা মানুষের দুর্ভাগ্যের সমস্তরকম অভিজ্ঞতা নিজেদের জীবনে সঞ্চয় করেছে, তারা আনতচক্ষে স্ট্যালিনকে স্মরণ করল। পুলিশ, গুপ্তচর আর অত্যাচারীদের ভিড়ের মধ্য থেকে নিউইয়র্কের সৎ ও শুভবুদ্ধির মানুষেরা শোকস্তব্ধচিত্তে বলে উঠল–"বিশ্ব শান্তির বন্ধু চলে গেলেন"।

আমাদের শত্রুরা ভেবেছিল, এই মহান শোকের সময় আমরা একা হয়ে যাব, আমাদের কোনো সমব্যথী থাকবে না। একথা সত্য, আমাদের শোক এতই মর্মান্তিক, যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যারা পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে ডলার-সেন্টে পরিমাপ করে, সেই সব ভ্রষ্টাচারীরা কখনোই এমন একজন মহান মানুষকে হারানোর বেদনা উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু এই সংকটময় মুর্হূতে আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, আমাদের বন্ধুর সংখ্যা কত- আমাদের শোক সারা মানবজাতির শোকে পরিণত হয়েছে।

ব্রাজিলের ক্ষেতমজুর, যে স্বপ্নেও মস্কোর কোনো বাজারের ছবি আঁকতে পারে না, ভাবতে পারে না, সোভিয়েতের গ্রামে কীভাবে লোকে জীবনযাপন করে, কোনো রাশিয়ানকে সে হয়তো জীবনে চোখেই দেখেনি, সে কোনওদিনও বরফাচ্ছাদিত জমি দেখেনি, সে জানেইনা ছুটিতে বিশ্রাম কি জিনিস। বহুশতাব্দীধরে সে উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আসছে, তার জীবনে খুশির মুহূর্ত খুবই দুর্লভ। কিন্তু সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মতই প্রশস্ত তার হৃদয় এবং সেই হৃদয়ে সেই মানুষটির জন্য ভাবনা সঞ্চিত আছে, যে মানুষটি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বাস করে এবং সকলের কল্যাণ কামনা করে। রোগাপাতলা সেই কৃষ্ণবর্ণের ক্ষেতমজুরটি জানে যে মস্কো নামে এক শহর আছে, যেখানে স্ট্যালিন বাস করেন। এই নাম তাকে নিরন্তর মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইতালি ও ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ট জল্লাদদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কমিউনিস্টরা, যাঁরা সাহসের সাথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁরা মৃত্যুর পূর্ব মুর্হূত পর্যন্ত যে চিঠি গোপনে পাঠাতে পেরেছিলেন, সেখানে তাঁদের প্রিয়নামের সাথে আর একটা নামও স্মরণ করেছিলেন- সে নাম হলো স্ট্যালিন। ফাঁসিকাঠে ঝোলানোর এক ঘন্টাআগে, রেবার, গেস্টাপোর চরম অত্যাচারে যে চলৎশক্তিহীন, তিনি স্ট্যালিনের নামে চিঠি লিখেছিলেন। স্ট্যালিনের নাম মুখে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল পেরী আর ড্যানিয়েল কামানোভা বীরত্বের সাথে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। স্ট্যালিনের নাম উচ্চারিত হয়েছিল সেই সব বীরদের কণ্ঠে যাঁরা মহাচীনে লংরুট মার্চে অংশ নিয়েছিলেন, উচ্চারিত হয়েছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হওয়া ক্যান্টনের সেই বীরদের কণ্ঠে। স্ট্যালিনের নামই ভিয়েতনামীদের স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রেরণা দেয়। স্ট্যালিনের শিকড় ছিল আমাদের ইতিহাসের গভীরে- আমাদের জন্মভূমির বিশাল প্রান্তরে প্রোথিত। কিন্তু মহীরুহ হয়ে তিনি দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে গিয়েছিলেন।

সেইসব ভয়ংকর দিনগুলি, যখন ফ্যাসিস্টদের হাতে সমগ্র মানবজীবন, সংস্কৃতি সবই প্রায় ধ্বংসের মুখে, তখন স্ট্যালিন মুক্তিফৌজকে রণাঙ্গনে নামালেন, সেই বাহিনীকে নেতৃত্ব দিলেন। পরাধীন দেশের বীর প্রতিরোধকারীদের- লিমুসিন, পিয়েদমন্ত, পোল্যান্ড আর শ্লোভাকিয়ার গেরিলাবাহিনীকে। প্রাগ, অসলো, এথেন্স আর তারানার বীরসন্তানদের তিনিই উদ্দীপ্ত করলেন, যার ফলশ্রুতিতে অচিরেই আমরা জয়লাভ করেছি। ফ্যাসিস্টদের পরাজয়ের পর যখন ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের দরজা উন্মুক্ত হলো, তখন মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের আলোয় ফিরে আসা নারীপুরুষের দল আনন্দাশ্রুভরা চোখে স্ট্যালিনের জয়ধ্বনি করেছিল। সারাবিশ্বের মানুষ স্ট্যালিনের সত্তুরতম জন্মদিনে তাঁর কাছে বহুমূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিল। উপহারগুলো বহুমূল্য, তার কারণ সেগুলি যুদ্ধের স্মারক সম্বলিত। যেমন ফ্রান্সের লোকেরা পাঠিয়েছিল একটি কলম, যা ভরা ছিল ব্যালাবিয়েন দুর্গের মাটিতে। যে যুগে ফরাসী দেশপ্রেমিকদের নাৎসীরা গুলি করে হত্যা করত, সেই বীরেরা নিজের দেশের জয়, মানবতার জয়, এবং স্ট্যালিনের জয় কামনা করে মৃত্যুবরণ করেছে।

স্ট্যালিন ছিলেন এক মহান সেনানায়ক। তিনি যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে তিনি ভালোমতো ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি এমন এক বাহিনীর নায়ক ছিলেন, যারা শান্তির জন্য যুদ্ধ করেছে। যিনি স্তালিনগ্রাদের ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলেন যে, এই গণহত্যাকারী দস্যুদের বিনাশ না করে আমরা বিশ্রাম নেব না। সকলেই জানে তারা কারা, যারা জনগণের বিজয়কে কলঙ্কিত করেছে, যারা আবার আর একটি যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত করছে।

আজ এই শোকের দিনে, সারা বিশ্বজুড়ে যারা শান্তির পক্ষে, তাদের রাজনৈতিক চিন্তা যাই হোক না কেন তারা সকলেই স্ট্যালিনের কাছে ঋণ স্বীকার করেন। হ্যাঁ, স্ট্যালিনই সেই ব্যক্তি, যিনি আর একটি যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্তকে ব্যর্থ করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে কোটি কোটি জনগণকে এবং হাজারো শহর নগরকে রক্ষা করেছেন। সেজন্যেই রোমের আলোকিত প্রাঙ্গনে তাঁর প্রতিকৃতি শোভা পায়, আর সেখানে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে, "স্ট্যালিনই শান্তি"। মিসিসিপি রাজ্যের ছোট্ট এক গ্রামে এক নিগ্রো শ্রমিক আমাকে বলেছিল-"ওরা আমাদের হত্যা করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু স্ট্যালিন তা হতে দিচ্ছেন না।" ডেনমার্কের একজন খুব সাধারণ, পাঁচসন্তানের জননী বলেছিলেন- 'আমার সন্তানদের জন্য আমার কোন ভয় নেই, স্ট্যালিন ওদের রক্ষা করবেন।' চীনের গ্রামে আমি স্ট্যালিনের ছবি দেখেছি। প্রশ্ন করলে তারা বলেছে- ' উনি আমাদের বাড়ি ঘর সব কিছুর রক্ষার্কতা।'

স্ট্যালিন সর্বদা জাতির স্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলেছেন। আজ সমস্ত জাতিগুলিই একথা উপলব্ধি করতে পারছে যে, স্বাধীনতা ছাড়া প্রতিরক্ষার কথা অর্থহীন। তাই বিশ্বে যে সমস্ত জাতি বা দেশ গোপন বা প্রকাশ্য আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের দেশে বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে, সেই লড়াইয়ে স্ট্যালিন তাদের সহযোদ্ধা।

শান্তির সংগ্রামের এই মহান সেনানায়কের মৃত্যুতে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের শোকাভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একথাও সত্য যে, স্ট্যালিন মৃত্যুহীন। তিনি কেবল তাঁর আপন কীর্তির মধ্যে জীবিত নেই, জীবিত নেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশাল শক্তির মধ্যে। তিনি জীবিত রয়েছেন কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। তাই স্ট্যালিনের হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হলে সারা বিশ্বের শোকসন্তপ্ত মানুষের হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়। সারা পৃথিবীর মানুষকে শান্তি ও সুখী জীবনের লক্ষ্যে স্ট্যালিনই একসূত্রে গেঁথেছেন। তাই সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে সারাবিশ্বের প্রগতিশীল জনগণও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবে- স্ট্যালিনের মৃত্যু নেই, তিনি মৃত্যুহীন।

(মহান নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ পদাপর্ণ উপলক্ষে আমরা সাম্যবাদে নভেম্বর বিপ্লব ও মহান মনীষীদের উপর ধারবাহিকভাবে লেখা প্রকাশ করছি। এ সংখ্যায় মহান স্ট্যালিনের উপর বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গের লেখাটি ছাপা হলো।)

রুটি-বিস্কুটে ট্যাক্স বসিয়ে তোলা টাকা ব্যয় হবে কার জন্য?

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দফায় দফায় বাড়ছে। ২০১৬-১৭ সালের বাজেট যখন হয়, তখনও আর এক দফা দাম বাড়ানোর ঘটনা সাধারণ গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করেছিলো। কিন্তু উপায় যেহেতু নেই, তাই সেটা মেনে নিয়ে, সংসারের এদিক-ওদিক থেকে কেটে-ছেটে তারা কোনোরকমে সংসারটা চালিয়ে নিচ্ছেন। এবারের বাজেটে কোনো জিনিসের দাম কি কমেনি? কমেছে। বাজেটে যেসব জিনিসের দাম কমানো হয়েছে সাধারণ মানুষ সেগুলোর নামও জানে না। মানুষ বুঝতেও পারেনি তরল প্রাকৃতিক রাবার, হুইট ক্রাশার, ফ্লাই অ্যাশ, প্যারাফিন ওয়াক্স ইত্যাদি পণ্যের দাম কমিয়ে কার লাভ হলো। কিন্তু সাধারণ ব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়ানোতে তাদের সংসারে যে তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন, যে চাপ তৈরি হচ্ছে মাসের শেষে; তা-তো দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

এবারের বাজেটে আরেকটি মূল্যবান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন জনদরদী অর্থমন্ত্রী মহোদয়। সেটার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। আগে কেজি প্রতি ১০০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত রুটি-বিস্কুটের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) অব্যাহতি সুবিধা ছিলো। এবারের বাজেটে এই অব্যাহতি সুবিধা তুলে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তার পাশের ছোট টং দোকানগুলোতে যে কেক-বিস্কুট-রুটি পাওয়া যায়, যা তৈরি করে সারা দেশের প্রায় ৪ হাজার ছোট ছোট বেকারি, এই সকল হস্তচালিত বেকারির পণ্যের একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মূসক অব্যাহতি সুবিধা তুলে নেয়ায় এই জিনিসগুলোর দাম বেড়ে গেছে। এসব পণ্যের ক্রেতা মূলত দেশের নিম্ন আয়ের মানুষ। শ্রমিক-দিনমজুর-হকার-রিকশাচালক-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-চাকুরিজীবীরা সারাদিনে কাজের ফাঁকে এইসকল হালকা খাবার খান। তারা দিনে কয়েক দফায় চায়ের সাথে এসকল খাবার খেয়ে কোনোরকমে ক্ষুধা মেটান।

এই রুটি-বিস্কুট-কেকের প্রত্যেকটি আইটেমের দাম বাড়ার ভোগান্তিটা আবারও সেই স্বল্প আয়ের মানুষদের ওপর দিয়েই যাবে। সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করে আদায় করা এই ট্যাক্সের টাকা থেকে গার্মেন্টস মালিকদের কাঁচামাল আমদানিতে কর ছাড় দেয়া হবে, স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হবে, ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে মওকুফ করা হবে, কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হবে, তিন-চার হাজার কোটি টাকার ব্যাংক কেলেঙ্কারিকে কিছুই না বলে উড়িয়ে দিয়ে হলমার্ক-বিসমিল্লাহ্ গ্রুপদের রক্ষা করা হবে, তাদের কেলেঙ্কারিতে হয়ে যাওয়া লোকসান পোষানোর জন্য রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকসমূহকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়া হবে- এই তালিকা যতো ইচ্ছা বাড়ানো যাবে এবং বাস্তবে এগুলোই হলো গরীবের রক্ত শোষণ করে তোলা রাজস্বের ব্যবহার। সাধারণ মানুষ জানেও না যে প্রতি বছর ট্যাক্স বাড়িয়ে, নতুন ট্যাক্স আরোপ করে, গরীব মধ্যবিত্তের একেবারে পাই পাই হিসেবের টাকায় ভাগ বসিয়ে জড়ো করা রাজস্ব দিয়ে সরকার কী কাজ করে? তাদের জীবনের কী উন্নয়ন হয়? কিংবা ভবিষ্যতের কোন্ বিরাট উন্নতির জন্য আজ তারা তাদের প্রাণ জেরবার করছে?

এর জবাব স্পষ্ট। সাধারণ মানুষের এই নিরন্তর নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার পথেই পুঁজিপতিদের সম্পদবৃদ্ধি হয়। সরকার একের পর এক নতুন নতুন ট্যাক্স বসিয়ে সাধারণ মানুষের দম আটকে দিচ্ছে, আর সেই টাকায় পুঁজিপতিদের ছাড়, ভর্তুকি, ঋণের টাকা মওকুফ করে দেয়া হচ্ছে। ক্রমাগত ট্যাক্স বসিয়েও আর যখন পোষাচ্ছে না, তখন একেবারে গরীব-নিম্নবিত্তের চা-বিস্কুটে পর্যন্ত ট্যাক্স বসছে। শত-হাজার কোটি টাকা রোজগার করা ব্যবসায়ীদের কর্পোরেট ট্যাক্স বাড়ানো হয়নি, উপরন্তু ব্যবসায়ীদের সভায় ব্যবসায়ী নেতারা কর্পোরেট ট্যাক্স ৩০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার দাবি করেছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, সেটা ভেবে দেখা হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই পণ্যগুলো তৈরি করে সারা দেশের ৪ হাজার ছোট ছোট বেকারি প্রতিষ্ঠান। প্রাণ গ্রুপসহ কয়েকটি বড় কোম্পানী বেশ কিছুদিন ধরে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে। তাদের উদ্দেশ্য এই খুচরো বাজার দখলে নেয়া। এবারের করের চাপে সাধারণ বেকারিগুলো তাদের পণ্যের দাম বাড়ালেও বড় কোম্পানিগুলো তা করেনি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে আমরা ধারণা করতে পারি, এই প্রক্রিয়ায় তারা বাজার থেকে ছোট বেকারিগুলোকে উৎখাত করে নিজেরা সে বাজার দখল করবে। তারপর একতরফাভাবে এগুলোর দাম বাড়াবে। সেটাও আরেকটা শঙ্কার দিক। তাতে এই ৪ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও তাদের পরিবার পথে বসবে। পুরো বেকারি মার্কেটটা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে চলে যাওয়ার পর তারা এগুলোর দাম বাড়াবে। ফলে এই ট্যাক্স বসানোর প্রভাব সুদূরপ্রসারী, সাধারণ মানুষকে সবদিক থেকেই আক্রান্ত করবে। জনগণ যদি এখনই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না তোলে তাহলে আমরা বারবারই এরকম মার খেতে থাকবো। প্রতিরোধই হলো পুঁজিবাদী সমাজে বাঁচার একমাত্র উপায়।

বাসদ (মার্কসবাদী)-র রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ

বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে নির্ধারিত সদস্যদের নিয়ে 'রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির' ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে গত ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৯ নভেম্বর রাত ৮টায় সমাপ্ত হয়। রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী প্রমুখ। শিক্ষা শিবিরের উদ্বোধনী বক্তব্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, 'বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের তীব্র শোষণে দেশে দেশে শোষিত মেহনতী মানুষ অসহায়, দিশেহারা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এক গভীর সংকটে নিপতিত। বেঁচে থাকার মরণপণ চেষ্টায় আজ বিশ্বের দেশে দেশে যুদ্ধ রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানুষকে বিভক্ত করার যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, সামরিক আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে, যাতে শোষিত মানুষ বিভক্ত থাকে, তাদের মধ্যে যাতে ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে। বাংলাদেশের অবস্থাও এর চেয়ে ভিন্ন নয়। গায়ের জোরে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ২য় দফা ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী মহাজোট (গত ৩ বছর যাবৎ) ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। জনস্বার্থ ও মতের তোয়াক্কা না করে একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন বিনাশী রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ক্ষমতাসীনদের বেপরোয়া লুটপাট ও দখলের যে উন্মত্ততা তারই সর্বশেষ নজির নাসিরনগরে সরকারি এমপি-মন্ত্রী-স্থানীয় দখলদারদের ছত্রছায়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাড়ী-মন্দিরে ভাঙচুর-লুটপাট। গাইবান্ধায় আধিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য নারকীয় নির্যাতন চালিয়ে ৪জনকে হত্যা করা হয়েছে। পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে আড়াই হাজার ঘর-বাড়ি। সরকারি স্থানীয় কায়েমী স্বার্থবাদী লোকেরা এর সঙ্গে যুক্ত। নিন্দা-ক্ষোভ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদছে। প্রশাসন চলছে ক্ষমতাবানদের অঙ্গুলি হেলনে। এরকম চরম অগণতান্ত্রিক পরিবেশে অত্যাচারিত জনগণের দুঃখকে ভাষা দিতে পারে এমন কোনো রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতি জনগণের ওপর আক্রমণকে আরো তীব্র করছে।

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আরো বলেন, জনগণের জীবনে আজ যে দুঃখ দুর্দশা তার কারণ পুঁজিবাদ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এ থেকে মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কিন্তু শুধু আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, যে কোনো ভাবে লড়াই করলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা বিপ্লব হবে না। এর জন্য চাই সঠিক বিপ্লবী দল যা একটা দেশের সমাজ বাস্তবতাকে যথার্থ রূপে বিশ্লেষণ করে গড়ে উঠতে হয়। এ লক্ষ্যে এ দেশের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তা নায়ক শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে বাসদ (মার্কসবাদী) দলে যে সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে তাকে শক্তিশালী করতে হবে। গণআন্দোলনের ধারায় সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে।' উল্লেখ্য যে এবারের শিক্ষাশিবিরে 'কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের মূলনীতি(লেনিন),' 'কেন এসইউসিআই ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল(শিবদাস ঘোষ),' 'সর্বহারা শ্রেণীর দল গঠনের সমস্যা প্রসঙ্গে' তিনটি পুস্তিকার উপরে তিনদিন ধরে অংশগ্রহণকারী কমরেডরা আলোচনা করেন।

পুলিশের হাতে শিক্ষক হত্যা সারাদেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ নভেম্বর দুপুর ১ টায় জেলার ফুলবাড়িয়া কলেজে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উপর হামলায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাকৃবি শাখা মানববন্ধন করেছে। বাকৃবি শাখা সাধারণ সম্পাদক গৌতম করের সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি জুনায়েদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী শেখ ফরিদ, আরিফুল হাসান, মাগফুরা জেরিন, রিয়াদ হাসান।

ঢাকা : শিক্ষক হত্যার প্রতিবাদে একই দিন সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ঢাবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক প্রগতি বর্মণ তমা, গোবিন্দ দাস খোকন মোহন্ত, তৌফিকা লিজা প্রমুখ।

সিলেট : সিলেটে নগর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াত আহমেদ। মিজানুর রহমানের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন মোখলেছুর রহমান, এ্যাডভোকেট উজ্জল রায়, শিক্ষক ফজলে রহমান চৌধুরী, অপু কুমার দাশ , রুবেল মিয়া , সাদিয়া নোশিন তাসনিম।

খাগড়াছড়ি : এদিকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সংগঠনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ও বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সংগঠক কবির হোসেন, অরিন্দম কৃষ্ণ প্রমুখ।

খাগড়াছড়ি

সুন্দরবন রক্ষায় জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশে জনতার ঢল দাবি না মানলে ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল

প্রতিদিন পত্রপত্রিকায়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় দেখতে হয় গা শিউরে ওঠা নানা খবর। দেখতে দেখতে মানুষের অনুভূতিও কেমন যেন ভোঁতা হয়ে আসে। এত এত অমানবিক ঘটনা প্রতিদিন ঘটছে, অথচ কোনোটিরই কোনো প্রতিকার-প্রতিবিধান নেই। আইন-বিচার কোনো কিছুই আজ সাধারণ মানুষের পক্ষে নেই। "নাহ্। এদেশে কিছু হবে না" - এমন ধারণা আজ কেবল বদ্ধমূলই নয়, সামাজিক স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন যে কোনো ক্রিয়াতে তৎপর হবার ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রয়োজনে জেগে ওঠার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক। তাই মানুষের প্রতি সংবেদন যেখানে হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে জীববৈচিত্র্য বা সুন্দরবনের প্রতি কতটুকু সংবেদন আশা করা যায়?

২৬ নভেম্বর জাতীয় কমিটির মহাসমাবেশ যারা দেখতে এসেছিলেন তারা নির্দ্বিধায় বুঝবেন, সংবেদশীলতা হারিয়ে যায়নি সমাজ থেকে। সবার চোখে-মুখে ছিলো এক প্রাণজাগানো আকুতি- 'বাঁচাতে হবে সুন্দরবন।' এরই প্রতিধ্বনি প্রকাশ পেলো আনু মুহাম্মদের কণ্ঠে- "মানুষ না থাকলেও সুন্দরবন থাকবে, কিন্তু সুন্দরবন না থাকলে মানুষ থাকবে না।"

শিশু, বৃদ্ধ, নারী, কৃষক, শ্রমিক- কে আসেনি সেদিন? উত্তরবঙ্গ থেকে কৃষকরা এসেছেন ফসল কাটার কাজ-মজুরি বাদ দিয়ে। সারাদিন হড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে না পাওয়া শ্রমিকরা এসেছেন। নবজাতক কোলে নিয়ে এসেছেন মায়েরা। বড় দলগুলোর সভায় টাকা দিয়ে যে লোক জড়ো করা হয়, তাদের চোখে দীপ্তি থাকে না, তারা ভাড়ায় জমায়েত বাড়াতে আসে। কিন্তু সেদিন শহীদ মিনারের সভাস্থলে বসেছিলো কয়েক সহস্র দীপ্তিময় মুখ।

মহাসমাবেশ অভিমুখে বাসদ (মার্কসবাদী)-র মিছিল

মধ্যবিত্ত জীবনের নানা টানাপোড়েনের ঘটনা আমরা জানি। হিসেবে হিসেবে জীবন পার হয়ে যায়। সেই জীবন ভেঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে নাঈমউদ্দিন ছুটে এসেছিলেন মাতৃহারা দুই সন্তানকে নিয়ে, প্রাত্যহিক উদ্বিগ্নতাকে পাশ কাটিয়ে। সভা শেষ করে আবার ফিরে যান চট্টগ্রামে। পরদিন সকালে ছেলেমেয়েদের খাইয়ে আবার স্কুলে নিয়ে যেতে হবে! এভাবেই শহীদ মিনার যেন এক মোহনায় পরিণত হয়েছিল সেদিন, ঐদিন সারাদেশ থেকে আগত জনতার স্রোত মিলেছে এই এক মোহনায়। সমাবেশের নির্ধারিত সময়ে পূর্বে সকাল থেকেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পরিবেশনায় সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলনের নাটক-গান পরিবেশিত হতে থাকে। দুপুর ২টা থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠনের মিছিলগুলো একে একে আসতে থাকে। সমাবেশ শুরুর আগেই শহীদ মিনার জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বেলা ৩টায় আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, বাসদ(মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন নান্নু, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, জাতীয় গণ ফ্রন্টের সভাপতি টিপু বিশ্বাস, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আহ্বায়ক মাসুদ খান প্রমুখ। সমাবেশে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, সরকার রামপালের মতো সুন্দরবন বিনাশী প্রকল্প করছে আর বলছে এসব উন্নয়নের জন্য হচ্ছে। এই উন্নয়ন ৯৯জনকে বঞ্চিত করে একজনের উন্নয়ন। এই উন্নয়ন পুঁজিবাদী উন্নয়ন। যারা দেশে লুটপাট করে বিদেশে টাকা পাচার করছে, তারাই এসব উন্নয়নের কথা বলছে। এসব উন্নয়নের মানে হচ্ছে গাইবান্ধায় সাওতালদের, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিন্দুদের, রামু থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের উন্নয়ন।

সবার বক্তব্য শেষে আনু মুহাম্মদ নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি ২৬ ডিসেম্বর দেশব্যাপী দাবি দিবস, ৭ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস, ১৪ জানুয়ারি জ্বালানি সংকট নিরসনে বিকল্প প্রস্তাবনা উপস্থাপন। এর মধ্যে দাবি মানা না হলে ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালনের ঘোষণা করেন। উপস্থিত জনতা মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচীকে স্বাগত জানায়। এবং সুন্দরবন রক্ষায় আরও কঠোর সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সমাবেশ শেষে একটি দীর্ঘ মিছিল টিএসসি শাহবাগ, মৎস ভবন হয়ে প্রেসক্লাবের কদম ফোয়ারার সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

সারাদেশে পার্টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সিলেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে র‍্যালি ও শিশু কিশোর মেলার মার্চ পাস্ট

সিলেট

১৯ নভেম্বর '১৬ বিকাল ৪ টায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জেলা পার্টির উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য জননেতা কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল এবং সভাপতিত্ব করেন পার্টির জেলা আহবায়ক কমরেড উজ্জল রায়। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট হুমায়ুন রশীদ সোয়েব এবং পরিচালনা করেন সুশান্ত সিনহা সুমন। জনসভার পূর্বে একটি সুসজ্জিত র‍্যালী সিলেট রেজিষ্টারি মাঠ থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে মিলিত হয়। র‍্যালীর অগ্রভাগে ছিল শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সুশৃংখল মার্চ পাস্ট।

খাগড়াছড়ি

জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় পার্টির জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড জাহেদ আহমেদ টুটুলের সভাপতিত্বে ও নাজির হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য কমরেড অপু দাশ গুপ্ত ও জেলা কমিটির সদস্য কবির হোসেন।

সুন্দরবন রক্ষার দাবিতে গাইবান্ধায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিক্ষোভ

রামপালে সুন্দরবন বিধ্বংসী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি করেজ শাখার উদ্যোগে ২১ নভেম্বর সকালে সরকারি কলেজে বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ কর্মসূচী পালন করে। সংগঠনের কলেজ শাখার সভাপতি পরমানন্দ দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শামীম আরা মিনা, কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আলম প্রমুখ।

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ও নাটক মঞ্চস্থ

গত ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের নামে বাংলাদেশকে মরুভূমি করার চক্রান্তের প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ও নাটক মঞ্চস্ত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সমস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মশিউর রহমান এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মাহাথির মুহাম্মদ। আলোচনা সভার পর জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটার পরিবেশিত নাটক 'একটি নন ফিকশন' মঞ্চস্থ হয়।

সুন্দরবন রক্ষায় বগুড়ায় সাইকেল র‍্যালি

গত ১৬ নভেম্বর রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবিতে বগুড়ায় সর্বস্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দের উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সাইকেল র‍্যালি উদ্বোধন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহফুজুল হক দুলু।

অনার্স ১ম বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গাইবান্ধা সরকারি কলেজে ছাত্রফ্রন্টের মিছিল

গাইবান্ধা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের নবাগত শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট কলেজ শাখার উদ্যোগে গতকাল মঙ্গলবার একটি মিছিল কলেজ ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে অর্থনীতি বিভাগের সামনে সংগঠনের সভাপতি পরমানন্দ দাসের সভাপতিত্বে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি শামীম আরা মিনা, কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আলম, দপ্তর সম্পাদক বন্ধন কুমার বর্মণ প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ভর্তি সংকট নিরসনে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন নতুন বিভাগ চালুসহ স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল, পর্যাপ্ত ক্লাশ রুম নির্মাণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা এবং লাইব্রেরী সেমিনারে পর্যাপ্ত নতুন সংস্করের বই ক্রয়ের দাবি জানান।

এম.সি.কলেজ : এম.সি. কলেজের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের অনার্স ১ম বর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ১৫ নভেম্বর দুপুর ১২ টায় কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এম.সি. কলেজ শাখার অন্যতম সংগঠক সাদিয়া নোশিন তাসনিম এর সভাপতিত্বে ও আল-আমিন এর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা রেজাউর রহমান রানা, সাধারন সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ, কলেজ শাখার সংগঠক পিংকি চন্দ প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীকী গণভোট

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কেউ বুঝুক না বুঝুক, আমরাতো জানি আমাদের কী ভয়াবহ ক্ষতি হতে যাচ্ছে।"

সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের নানা চাপের মধ্যেও ছাত্ররা ভোট দিয়েছেন সাহস করে। দু'জন ছাত্র কলাভবনের করিডোরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। ভোটের কথা বলতেই একজন সাথে সাথে ভোট দিয়ে দিলেন। অন্য বন্ধু বললেন, "তুই সুন্দরবনের পক্ষে ভোট দিয়ে দিলি? কাদের সিটে আমরা থাকি একবার ভাববি না?" তখন প্রথমজন বললেন, "আমি হলে থাকতে হবে বলে ওখানে যাই-ই করি না কেন, ক্লাসরুমে তো আমি তো তা না। আমার বিবেক বুদ্ধি আছে।"

একেবারে সরাসরি ছাত্রলীগের কর্মীও ভোট দিয়েছেন। দিয়ে বলেছেন, "আমি ছাত্রলীগ করি তাই রামপালের পক্ষে বলি। কিন্তু আবার আমি তো মানুষ, তাই সুন্দরবনের পক্ষে ভোট দিলাম।"

ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় শাখার সভাপতি ইভা মজুমদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সালমান সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় রায় ঘোষণার অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বদরুল ইমাম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিমউদ্দীন খান, একাউন্টিং এন্ড ইন্‌ফরমেশন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, বাসদ(মার্কসবাদী)-কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য ফখরুদ্দিন কবির আতিক ও সাইফুজ্জামান সাকন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা।

ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন এমন একজন মন্তব্য করছিলেন রায় ঘোষণার দিন, "বাহ্। একটা তুলনামূলক ছোট সংগঠনের অল্প কিছু ছেলেমেয়ে ঘুরে ঘুরে দশ হাজার মানুষকে স্পর্শ করলো! এটা আদর্শের জোর ছাড়া হয়? শুধু লোক জড়ো করলেই কি সংগঠন বলা যায়?"

তবে কর্মীদের আক্ষেপ, আরও বেশি মানুষের কাছে যেতে পারলে ভালো হতো। এক শিক্ষার্থী তো ভোট দিয়ে বলেই ফেলেছিলেন,"আমি আরও দুটো ভোট দিতে চাই।" কেন জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন,"আমার দুজন রুমমেট। আমি জানি তারা থাকলে সুন্দরবনের পক্ষেই ভোট দিতো।"

তত্ত্ব ও চরিত্রের সাধনা দরকার, এ ছাড়া কোনো দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারবে না

(২য় পৃষ্ঠার পর) আমেরিকার অর্থনীতি পুরোপুরি অস্ত্র নির্ভর। এই জন্য আমেরিকা বিভিন্ন দেশকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেয়া, দেশে দেশে ক্যু করাসহ বিভিন্ন নোংরা ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আবার সে সারা বিশ্বের মানুষকে এমন ভয় দেখাতে থাকে যে তাকে খোঁচালে আণবিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আর তা শুরু হলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অতএব, সভ্যতা রক্ষার স্বার্থে যাতে তাকে বিরক্ত করা না হয়।

আমেরিকার এই যুদ্ধচক্রান্ত বানচাল করাই ছিলো সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতা হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজ। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, এর জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দরকার ছিলো চারটি কার্যক্রম। প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তাকে কাজে লাগানো। দ্বিতীয়ত, নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সাথে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের যে দ্বন্দ্ব আছে তাকে কাজে লাগানো। তৃতীয়ত, যেসকল পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের জন্য এবং যে সকল ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জনগণ স্বাধীনতার জন্য লড়ছে- সে সকল লড়াইকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা। চতুর্থত, আন্তর্জাতিক দিক থেকে এমন 'ডিপ্লোমেটিক লাইন' নেয়া যাতে আমেরিকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একবারে একঘরে হয়ে যায়। কারণ আমেরিকাই আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন অদ্ভুতভাবে আমেরিকার নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হয়ে পড়লো। আণবিক বোমার অধিকারী দু'দেশই ছিলো। আমেরিকা যেমন ছিলো, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নও ছিলো। কিন্তু গোটা বিশ্ব ফুঁস করে ধ্বংস হয়ে যাবে- আমেরিকার এরকম একটা তৃতীয় শ্রেণীর ক্যাম্পেইনে সাধারণ একটা মানুষের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নও ভয় পেয়ে গেলো। ভয় পেয়ে গেলো এজন্য যে তারা তো নিজে এটাকে কোথাও প্রয়োগ করবে না। যদি আমেরিকা প্রয়োগ করে তাহলে তো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন দুনিয়া ধ্বংস না হয়ে যাবার জন্যে যতরকম ছাড় আমেরিকাকে দিতে হয় তা তারা দেয়া শুরু করলো। আপোষ করতে শুরু করলো।

অথচ আণবিক যুদ্ধ বানচাল করার শর্তই ছিলো আনবিক শক্তিতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা। মানুষকেও দেখানো দরকার ছিলো যে, আমেরিকা যুদ্ধ লাগলে কি হয়ে যেতে পারে তা বলছে, অথচ এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, যুদ্ধ লাগা না লাগার ব্যাপারে তার যেন কোনো দায়িত্ব নেই। তার এই চালাকিটাও উন্মোচিত করা উচিত ছিলো।

কিন্তু সোভিয়েত নেতৃত্ব তা ধরতেই পারলেন না। উপরন্তু এমন কিছু ভুল পদক্ষেপ তারা নিলেন যে তা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের গৌরবকেই অনেকখানি খাটো করে দিলো।

আপনারা জানেন ১৯৫৩-৫৪ সালের দিকে আমেরিকা কোরিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। কমরেড কিম ইল সুন- এর নেতৃত্বে কোরিয়ার ওয়ার্কার্স পার্টি কোরিয়ার স্বাধীন জনগণকে সাথে নিয়ে লড়াই করতে করতে যখন সামনে এগোচ্ছিলো, তখন আমেরিকা জাতিসংঘের নামেই চৌদ্দটি দেশকে সাথে নিয়ে এতে হস্তক্ষেপ করে। তখন চীন সেখানে কোরিয়ানদের পক্ষে দুই লক্ষ ভলান্টিয়ার পাঠায়। এরা কোরিয়ান বিপ্লবীদের সাথে মিলে আমেরিকান বাহিনীকে বলতে গেলে প্রায় লাঠি পিটিয়ে সিউল পর্যন্ত নিয়ে আসলো। কারণ আমেরিকান বাহিনীর মতো অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের ছিলো না। এই যুদ্ধে হেরে আমেরিকা পরাজয়ের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছিলো। তার বন্ধু দেশসমূহের সামনে দাঁড়িয়ে সে যে শ্রেষ্ঠ এই কথা বলার মুখ আর তার ছিলো না। এই মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য সে নানারকম চেষ্টা করছিলো। এই হারানো মর্যাদা সে ফিরে পেতে সক্ষম হয় সোভিয়েতের একটা ভুলের কারণে। সোভিয়েত কিউবায় তার একটি মিসাইল স্থাপন করলো। আমেরিকা এটি দেখিয়ে ক্যাম্পেইন করতে থাকে যে, সোভিয়েত আমার নাকের ডগায় মিসাইল বসিয়েছে, সে আমাকে আক্রমণ করতে চায়। অথচ সোভিয়েতের এই মিসাইল স্থাপনার কোনো দরকার ছিলো না। কারণ তার কাছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালাস্টিক মিসাইল মজুত ছিলো যা দিয়ে সে যে কোনো সময় আমেরিকার মূল ভূমিতে আঘাত হানতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এই ঘটনাকে দেখিয়ে একদিকে বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার চালায় যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবাজ, যে কোনো সময় সে যুদ্ধ লাগাতে পারে, অন্যদিকে সোভিয়েতের কিউবাগামী বাণিজ্য জাহাজকে 'ষষ্ঠ নৌবহর' দিয়ে আটকে দেয়। তার উদ্দেশ্য ছিলো এখানে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়া। ক্রুশ্চেভ এই ঘটনা শুনে বোকার মতো বাণিজ্য জাহাজকে নৌবহর ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে বললেন। খবরটি গণমাধ্যমে প্রকাশও পায়। সাথে সাথে আবার সোভিয়েতের সমর বিশেষজ্ঞরা এ ভুল ঠিক করে দেন। আর একথা সহজেই অনুমেয় যে, ঐ জায়গায় কোনো আঞ্চলিক যুদ্ধ লাগলে আমেরিকাই জিতবে। কারণ সেখান থেকে সোভিয়েত মূল ভূখণ্ডের দূরত্ব প্রায় ৬০০০ মাইল কিন্তু আমেরিকার দূরত্ব ৯০ মাইল। ফলে সেখানে যুদ্ধ হলে সোভিয়েত কোনো লজিস্টিক সাপোর্ট পাবে না। সোভিয়েত তখন কিউবা থেকে তার মিসাইল স্থাপনা প্রত্যাহার করে নেয়। এই ঘটনায় আমেরিকা কোরিয়াতে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে।

আরেকটা ঘটনা ঘটালো তারা ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে। যেটি সাংবাদিকদের ভাষায় 'টনকিন সঙ্কট' নামে পরিচিত। ভিয়েতনামের ইতিহাসটা আমি ছোট করে একটু বলি। ভিয়েতনাম বহুকাল ফ্রান্সের কলোনী ছিলো। ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে উত্তর ভিয়েতনামের স্বাধীন হওয়ার ভিত্তি তৈরি হয়। দিয়েন তিয়েন ফু বলে একটা জায়গায় ফ্রান্সকে তারা পুরোপুরি পরাজিত করে। ফ্রান্স তখন সে দেশ ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু যাওয়ার আগে তারা জাতিসংঘের সাথে যুক্ত হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে একটি আলাদা দেশ হিসেবে ঘোষণা করে। বাদওয়াই সম্রাটের শাসনে তা পরিচালিত হতে থাকে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে তখন মুক্তির জন্য লড়াই চলতে থাকে। এই আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য সেখানে নামতে থাকে। প্রচুর আমেরিকান সৈন্য মারাও যায় সে যুদ্ধে। যুদ্ধের একটা পর্যায়ে এসে আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে বোমা মারতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন সাধারণ কিছু যুদ্ধসাহায্য ছাড়া উত্তর ভিয়েতনামের জন্য আর কিছু করলো না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের দায়বদ্ধতা ছিলো এই যে, কোনো একটা সমাজতান্ত্রিক দেশের উপর যদি আক্রমণ হয়, তাহলে তা সোভিয়েতের উপর আক্রমণ বলেই তারা মনে করবে। অথচ সমাজতান্ত্রিক উত্তর ভিয়েতনামের ব্যাপারে তাদের এই ভূমিকা দেখা গেলো না। কিছু অস্ত্রশস্ত্র দেয়া ছাড়া তারা আর কিছু করলো না। করলো না আমেরিকার আণবিক ব্ল্যাকমেইলিংয়ের শিকার হওয়ার কারণে, স্ট্যালিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বুঝতে না পারার কারণে।

স্ট্যালিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ক্রুশ্চেভ নেতৃত্ব বিকৃত করে ফেললেন। স্ট্যালিনের নীতি ছিলো সোভিয়েত কোনো দেশে কখনও হস্তক্ষেপ করবে না, তার দরকারও নেই। বিপ্লব করার জন্যও সে করবে না। কারণ বিপ্লব নিজ নিজ দেশের মধ্য থেকে তার নিজস্ব নিয়মেই গড়ে ওঠে। একে আমদানি-রপ্তানী করা যায় না। সেকারণে সোভিয়েতের অন্য দেশ আক্রমণের কোনো চিন্তাও নেই। কিন্তু আমেরিকারও উচিত নয় অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। তাকেও সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

অথচ ক্রুশ্চেভ এই নীতি থেকে সরে আসলো। সোভিয়েত নেতৃত্ব বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বের আসনে বসে থেকে একের পর এক ভুল পদক্ষেপ নিতে থাকলো। এই সকল আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি বুঝাতে চাইছি যে, ঘটনার সময় ভুল পদক্ষেপ নেয়াটাতো একটা ভুল। কিন্তু সে ভুল কেন হয়? সোভিয়েত নেতৃত্বের চেতনার অনুন্নত মানই এই সমস্ত ভুল চিন্তা গড়ে ওঠার পেছনে দায়ী। দলের মধ্যে আদর্শগত চর্চা ও নেতা-কর্মীর দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক না থাকলে চেতনার এই অনুন্নত মান দূর হয় না। আর এটি প্রতিনিয়ত উন্নত করার বিষয়। একবার উন্নত হলেই যে সবসময় একইরকম থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের 'ন্যাশনাল ভ্যানিটিমুক্ত' বোঝাপড়াও তখনকার সময়ে জরুরি ছিলো। কারণ যেহেতু বিপ্লবটা জাতীয় তাই তার মধ্যে 'ন্যাশনাল ফিলিং' থাকেই। সেটা যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার আবার এই 'ন্যাশনাল ফিলিং'-কে আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা দিয়ে প্রতিস্থাপনও করা দরকার। তখন সেটা আর আগের মতো থাকে না। ক্রমাগত কমতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বোঝাপড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো হলে চলে না। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক- সমস্ত দিক থেকে তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া জরুরি ছিলো। কিন্তু দুঃখজনক, তা হয়নি। এসবের নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়নের, তারা তা পারেনি। এরকম আরও বহু ব্যাপার আছে কমরেড, একটা সভায় যার সবকিছু আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমার এই আলোচনা সে অর্থে পূর্ণাঙ্গও নয়। আমি একটা আংশিক ক্ষেত্র, একটা দিক দেখানোর চেষ্টা করলাম।

আমি যে কথাটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, কমরেড, তত্ত্ব ও চরিত্রের সাধনা খুবই দরকার। এ ছাড়া কোনো দেশের কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা বিপ্লব সম্পন্ন করতে পারবে না, বিপ্লবকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারবে না। সে আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলবে, জাতীয়তাবাদী নানা ধরনের চিন্তার শিকার হয়ে যাবে। ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টি অতুলনীয় লড়াই করে, বিরাট শৌর্য-বীর্য দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। সেসময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে সকল সমস্যা চলছিলো তাতে তাদের নিজস্ব কোনো বক্তব্য ছিলো না। ফলে তারা অনেক আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করলো ঠিকই, কিন্তু দেশটি আবার জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ফেঁসে গেলো। চীনের উদাহরণ দেখুন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নবম ও দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, তারা তাদের তত্ত্বগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি এখনও পূরণ করতে পারেনি। যৌথ নেতৃত্ব ও তার বিশেষীকৃত প্রকাশের মধ্য দিয়ে দলের মধ্যেকার সমস্ত রকম ব্যক্তিবাদী চিন্তাকে পরাস্ত করার সংগ্রামকে তারা তত্ত্বায়িত করতে পারেনি। পারেনি বলে একদিন না একদিন এর ক্ষতিকারক দিক তারা টের পাবে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব করা এই পার্টি কী করুণ পরিণতি বরণ করলো।

ফলে কমরেড, আদর্শগত চর্চা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দলের ক্ষেত্রেও বলতে হয়, আমাদের দলকে আদর্শগতভাবে সংহত করা খুব জরুরি, যতক্ষণ পর্যন্ত যৌথ নেতৃত্বের সর্বোন্নত প্রকাশ ঘটাবার মতো বাস্তব অবস্থা আমরা সৃষ্টি করতে না পারি- ততক্ষণ পর্যন্ত এ সংগ্রামকে আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। মহান নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনে দল গড়ে তোলার সংগ্রামে আপনারা ব্যক্তিগত সকল বাধা তুচ্ছ করে নিমগ্ন হবেন- এই আহবান রেখে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ান

(১ম পৃষ্ঠার পর) সেখানকার নাগরিকত্ব আইন অনুসারে বার্মা ভূ-খণ্ডে ঐতিহাসিকভাবে বসবাসরত ১৩৫টি নৃ-গোষ্ঠীর তালিকায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নাম রাখা হয়নি। নাগরিকত্ব না থাকার কারণে তারা ভোটাধিকার, জমির বৈধ মালিকানা, সরকারি চাকরি-স্বাস্থ্যসেবা-শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এমনকি ভ্রমণ-বিয়ে-সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রেও সরকারি অনুমোদন নিতে হয়। রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনসংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক ৮-১০ লাখ। বাংলাদেশে দুটি শরণার্থী শিবিরে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা আছে ৩২ হাজার জন, এর বাইরে অবৈধভাবে বসবাস করছে অন্তত ৫ লাখ। আরো কয়েক লাখ রোহিঙ্গা সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। কক্সবাজার অঞ্চলে মাফিয়া গডফাদাররা ইয়াবাসহ মাদক, অস্ত্র চোরাচালান ও নানা অপরাধমূলক কাজে হতদরিদ্র রোহিঙ্গাদের অনেককে ব্যবহার করে। স্থানীয় প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামায়াত নেতারা এদের অবৈধভাবে ভোটার বানিয়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে কাজে লাগায়। বিভিন্ন ইসলামিক এনজিও রোহিঙ্গাদের সহযোগিতার নামে মৌলবাদী রাজনীতির প্রসার ও জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে তৎপর আছে।

আজকে যখন নতুন করে রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিতে আসছে তখন প্রশ্ন উঠেছে – ঘনবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের বাংলাদেশ এদের দায়িত্ব কতটুকু নিতে পারবে? আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মিয়ানমারের সমস্যা সেখানেই সমাধানের জন্য চাপ না দিয়ে বাংলাদেশকে কেন সীমান্ত খুলে দিতে বলছে? আসলে অসহায় মানুষ প্রাণ বাঁচাতে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আশ্রয় দেব কি দেব না তা বিবেচনার বিষয় হতে পারে না, কষ্ট হলেও তাদের আশ্রয় দেয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে এক কোটি বাঙালী ভারতে আশ্রয় না পেলে কি পরিণতি হতো? প্রশ্ন হচ্ছে – কি প্রক্রিয়ায় আশ্রয় দেয়া হবে, কতদিনের জন্য এবং কীভাবে দ্বিপাক্ষিক-আঞ্চলিক কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে ও আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করা যায় রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে, তাদের অধিকার-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। তাছাড়া সরকার যতই বাধা দিক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ বন্ধ করা বাস্তবে সম্ভব নয়, ফলে না চাইলেও বাংলাদেশকে চাপ নিতে হচ্ছে। বরং জাতিসংঘকে যুক্ত করে ঘোষণা দিয়ে নির্দিষ্ট আশ্রয়শিবিরে সাময়িক আশ্রয় দেয়া হলে ও আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিবন্ধন-তথ্যভাণ্ডার করা থাকলে তা মিয়ানমারের ওপর **আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করার জন্য সহায়ক হতে পারে। পাশের ঘরে আগুন লাগলে নির্বিকার থাকা চলে না। দ্রুত এই মানবিক সংকট সমাধান করা না গেলে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়নকে পুঁজি করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক উস্কানি সৃষ্টির অপচেষ্টা কিংবা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আশংকা বাড়বে।**

কমরেড ফিদেল ক্যাস্ট্রো লাল সালাম

(১ম পৃষ্ঠার পর) নিশ্চিত করেছে। কিউবার মানুষের গড় আয়ু দুই আমেরিকা মহাদেশ মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি- নারীদের ৮২ ও পুরুষের ৭৬ বছর। কিউবায় প্রতি ১৫০ জন নাগরিকের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন। যেখানে পশ্চিম ইউরোপে ৩৩০ জনে ১ জন চিকিৎসক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪১৭ জনে ১ জন। ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজাখস্তানের আলমা আতায় যে 'আলমা আতা' কনভেনশন গৃহিত হয়, যেটি গ্রহণের পর সারা বিশ্বে একে বাস্তবায়নের জন্য সাড়া পড়ে গিয়েছিলো এবং পরে কর্পোরেটদের চাপে প্রায় সকল দেশের সরকার এথেকে সরে এসেছে, সেই 'প্রাইমারি ও প্রিভেন্টিভ হেলথ্ কেয়ার' এর পূর্ণ বাস্তবায়ন একমাত্র কিউবাই করেছে এবং করে যাচ্ছে। আজ কিউবার ডাক্তাররা মহান কমিউনিজমের আন্তর্জাতিকবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশে দেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যখন দুনিয়াব্যাপী তার তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে, সেই সময়ে তার নাকের ডগায় একটি ছোট্ট দেশ কিউবাকে ফিদেল সাম্রাজ্যবাদবিরোধীতার দুর্গে পরিণত করেছিলেন। আজ পৃথিবীতে মানবতার শত্রুরা দেশে দেশে আঞ্চলিক ও স্থানীয় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। যে কোনো দেশে যে কোনো সময় চড়াও হয়ে তার দখল নিচ্ছে, লক্ষ-কোটি মানুষকে হত্যা করছে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে আজ ক্ষত-বিক্ষত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশসমূহ। ফিদেল ক্যাস্ট্রো ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। আমেরিকা তাকে হত্যা করতে চেয়েছে বারবার। সিআইএ'র প্রাক্তন কর্মকর্তার ভাষ্যেই এসেছে ফিদেলকে প্রায় সাড়ে ছয়শত বারের উপর হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সকল বাধা মোকেবেলা করে ফিদেল বেঁচেছিলেন কিউবার জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গোটা বিশ্বে যখন সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রবল জোয়ার বইতে শুরু করলো, তখন ক্যাস্ট্রো তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত হাভানার জনস্রোতে উঁচিয়ে ঘোষণা করেছেন, "হয় সমাজতন্ত্র, নয় মৃত্যু।"

ফিদেলের নেতৃত্বে শিক্ষা-চিকিৎসা-খেলাধুলা কোন্ ক্ষেত্রে এগোয়নি কিউবা? লাতিন আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি অলিম্পিক পদক কিউবার। কিউবার খেলোয়াড়রা অন্যান্য দেশের মতো প্রচুর টাকা কিংবা স্পন্সর পান না। খেলা সেখানে ব্যবসা করার বিষয় নয়। সেই দেশই অলিম্পিকের মাঠ দাপিয়ে বেড়াতো। ফিদেল ছিল তাদের অনুপ্রেরণা। কোনো এক অলিম্পিকে এক সাংবাদিক একবার লিখেছিলেন,"অলিম্পিকে আজ ফিদেল এসেছেন। কিউবা পদক জিতবেই। ফিদেলকে দেখলে কিউবানরা দৈত্য হয়ে যায়।"

শুধু কিউবা নয়, ল্যাটিন আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুক্তিকামী হৃদয়ের প্রেরণা কমরেড ফিদেল। কমরেড ফিদেল, আমরা শপথ করছি- যে স্বাধীন, শোষণহীন, মর্যাদাময় জীবনের জন্য আপনি আপনার সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন, সেই মহান আদর্শ **ও মহান জীবনের লড়াই আমরা আমৃত্যু চালিয়ে যাব।**

প্রসঙ্গ : নাসিরনগর ও সাঁওতাল পল্লীতে হামলা

সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের বীজ রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামোর মধ্যেই নিহিত

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে একটা বিখ্যাত গান ছিল, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার মুসলমান/আমরা সবাই বাঙালী'। কেমন দেশ আমাদের সংগ্রামী পূর্বসূরীরা চেয়েছিলেন এ গানে তা ফুটে উঠেছে। কিন্তু ৪৫ বছর পর যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা সমাজ চিত্র আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান, তাতে এ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়– বাংলাদেশ এখন বিশেষ এক সম্প্রদায়ের দেশ, অন্যরা এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক! ধর্ম ভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রেও প্রায় সমস্ত অংশের মানুষ যেমন নিপীড়িত ছিল; সবচেয়ে বেশি অত্যাচারের শিকার হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। এদের একটা বড় অংশই '৪৭ এ অনেক ব্যাথা নিয়ে দেশ ছেড়ে গিয়েছিল। পিতৃভূমিকে ভালোবেসে যারা থেকে গিয়েছিল, ২৩ বছরের পাকিস্তান রাষ্ট্রে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। অধিকার বঞ্চিত মানুষের লড়াই গড়ে উঠলে পাকিস্তানীরা বার বার সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দিয়েছে। ধর্মীয় বিভাজনের সংকীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ করে শোষণমূলক রাষ্ট্রের স্বরূপ মানুষের কাছে আড়াল করেছে। এজন্য ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করেছে। এমনকি দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টাও করেছে, লাগিয়েছেও। হিন্দুর সম্পত্তিকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' করা হয়েছিল।

দীর্ঘ সংগ্রামের পরম্পরায় গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কথা ছিল এমন রাষ্ট্র হবে, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোনো প্রকার বৈষম্য থাকবেনা,সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার হবে না; রাষ্ট্র হবে ধর্ম নিরপেক্ষ। কিন্তু বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয়ের এ যুগে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিদ্যমান রাষ্ট্রের কাছে এ চাওয়া কেবলই সোনার পাথর বাটি– ৪৫ বছরে কি এটা হাড়ে হাড়ে বোঝা হয়নি?

রামু থেকে নাসির নগর- সব ঘটনার প্রকৃতি ও লক্ষ্য একই

গত নভেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মন্দির, বাড়ি-ঘরে হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ফেসবুকে একটি ছদ্ম আইডির মাধ্যমে দেয়া পোস্টকে কেন্দ্র করে। জনৈক রসরাজ দাসের নামে এ ফেসবুক আইডিতে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা হয়েছে– এরকম অপপ্রচার করে হামলার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ইউএনও, এমপি-মন্ত্রী সহ স্থানীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ এ ঘটনায় সরাসরি ইন্ধন দিয়েছেন, কেউ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের কেউ কেউ ওঝা সেজে পরবর্তীতে ছুটে গেছেন। কিন্তু ঘটনার হোতাদের কাউকেই বিচারের আওতায় আনা হয়নি।

কক্সবাজারের রামুতে ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জনৈক উত্তম কুমার বড়ুয়ার ফেসবুক থেকে কুরআন অবমাননার অভিযোগে ১২ টি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির এবং বৌদ্ধদের চল্লিশটি বাড়িতে আগুন দেয়া ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয় স্থানীয় উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি, মৎসজীবী লীগের সভাপতিসহ স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী সরকারি দলের লোকজন দ্বারা। বিএনপি-জামায়াতের নেতা-কর্মীরাও তাতে যোগ দিয়েছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর পটিয়ায় বৌদ্ধ ও হিন্দুদের বাড়ি-ঘরে ও মন্দিরে হামলার ঘটনা ঘটে।

পাবনার সাথিয়ায় স্থানীয় ক্ষমতাধরদের চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ফেসবুকে ছদ্ম আইডিতে মহানবীকে কটুক্তি করার অজুহাত তুলে জনৈক রাজীবকে বলির পাঠা বানিয়ে যখন তাণ্ডব চলছিল,স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অদূরেই ছিলেন। থানা ছিল ৫ মিনিট দূরত্বে। অথচ ঘর-বাড়ি পোড়ানোর দেড় ঘণ্টা পর পুলিশের দেখা মেলে। এ ঘটনার সঙ্গেও স্থানীয় আওয়ামী প্রভাবশালীরা যুক্ত ছিল।

যশোরের মালো পাড়ায় (২০১৪ সালের জানুয়ারিতে) হামলা হয় মূলত আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে।

উপরের প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখা যায়, সরকারের স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের স্বার্থজনিত বিরোধ, চাঁদাবাজি, হিন্দু জনগোষ্ঠীর বাড়ি-ঘর দখল, আতঙ্ক তৈরী করে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি নানা মনোবৃত্তি কাজ করেছে। অন্তত ৩টি ঘটনায় কাজে লাগানো হয়েছে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে। অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ঘটনাগুলোর সাথে জড়িত কারোরই বিচার করা হয়নি। এভাবেই বার বার সাম্প্রদায়িক হামলার প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছে আর আতঙ্কে-নিরাপত্তাহীনতায় দেশ ছেড়ে যাচ্ছে হিন্দু জনগোষ্ঠী। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী দেশে হিন্দু জনসংখ্যা ১০ লাখ কমেছে। অধ্যাপক আবুল বারাকাত গবেষণা করে দেখিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীনরাই হিন্দু জনগোষ্ঠীর জমি-সম্পদ দখল করেছে। পত্রিকায় একজন খুব আক্ষেপ করে বলেছেন, সরকার/আওয়ামী লীগ মনে করে দেশে থাকলে ভোট আমার, চলে গেলে জমি আমার।

কেবল ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী নয়, অব্যাহত নিপীড়নের শিকার সমতল-পাহাড়ের আদিবাসীরাও

গোবিন্দগঞ্জের বন্ধ চিনিকলের জমি যা পাকিস্তান আমলে সাঁওতালদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল, তা ফেরত দেবার দাবি তুলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছিল। এর মধ্যেই সাঁওতালদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৪ জনকে হত্যা করা হয়। এতেই শেষ হয়নি, পরবর্তীতে তাদের আড়াই হাজার ঘর পুড়িয়ে দেয়া হয়। প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় এম.পি চেয়ারম্যানসহ আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রবল ধিক্কার উঠলেও দোষীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পাহাড়ে প্রায় প্রতিদিনই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে, বাঙ্গালী-পাহাড়ী বিরোধ জিইয়ে রেখে ও ইন্ধন যুগিয়ে রাষ্ট্র এ ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাচ্ছে।

রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিহিত আছে

ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে যে দেশ সৃষ্টি করলো, মাত্র ৪৫ বছরে সে দেশে জনগণের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এমন মানসিকতা তৈরী হলো কেমন করে? কারাই বা করলো? আমরা জানি অর্থনীতি হলো সমাজের ভিত্তি। এর পরিপূরকভাবে রাজনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। যে বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রের অবসান চেয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, স্বাধীনতার পর তার কোনো হেরফের হয়নি। শাসন কাঠামোতে গণতান্ত্রিকতা ক্রমাগত সংকুচিত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার পরিপূরক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার সংগ্রাম পরিহার করে শাসক দলগুলো জনগণকে ক্রমাগত বিভক্ত করে ভোটের রাজনীতির স্বার্থ হাসিল করেছে। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্যমূলক বিভিন্ন ধারা এবং বাণিজ্যিকীকরণের নীতির ফলাফলে সমাজবিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যুক্তিহীন মনন তৈরী হয়েছে। সামরিক স্বৈরশাসকেরা তাদের গণবিরোধী রাজনীতিকে আড়াল করতে মুসলিম ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়েছে। কেউ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ উন্মুক্ত করেছে, কেউবা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বানিয়েছে। পরবর্তী শাসকরা ক্ষমতার স্বার্থে এর সুবিধা নিয়েছে। জামায়াতসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে কেউ শরীক, কেউবা তাদের সাথে কৌশলগত ঐক্য করেছে। এভাবে রাষ্ট্র ও সমাজ অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়েছে।

দুর্নীতি-লুটপাটের বিদ্যমান ব্যবস্থায়, স্তরে স্তরে এমন একটি জবরদস্তির সংস্কৃতি দাঁড়িয়েছে, যার শিকার হচ্ছে সমাজের দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এটি যেমন একটি দিক, পাশাপাশি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি তুলে ধরে যথার্থ সংগ্রামী রাজনৈতিক ধারার অনুপস্থিতিও বড় ব্যাপার। বদ্ধ জলাশয়ে শ্যাওলা জন্মানোর মতই এরকম প্রেক্ষাপটে সমাজের মধ্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে জনগণের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভেদ উস্কে দিয়ে নির্বিচার লুট ও দখলবাজীর রাজত্ব কায়েম করছে।

কিছু বিভ্রান্তিকর চিন্তা

নাসিরনগরে ঘটনার পর সারা দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে, সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগের লোকজনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা স্পষ্ট হওয়ার পরও কেউ কেউ জামায়াতী অনুপ্রবেশকারীরা করেছে– এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে তাদের সংশ্লিষ্টতাকে আড়াল করতে চাইছেন। কেউ '৭২ এর সংবিধানে ফিরলেই সমাধান– এরকম পথ্য হাজির করেছেন। ৪৫ বছরের শোষণ-বঞ্চনার ভিত্তির উপর শাসকদের গণবিরোধী ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির কারণে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার যে পরিবেশ সৃষ্টি হলো, তার বিরুদ্ধে পাল্টা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগ্রাম না করে কতগুলো শব্দমালা সংবিধানে জুড়ে দিলে অথবা সংবিধান অক্ষত থাকলেই কি এ অবস্থার অবসান হবে? অথবা বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ– এ জাতীয় উচ্চারণও কার্যত মিষ্টি কথায় ক্ষত সারানোর মত ব্যাপার।

উত্তরণের পথ কি?

হিন্দু, বৌদ্ধ, সাঁওতাল- যেই হোক, ধর্মীয় ও জাতিগত পরিচয় তার গৌণ পরিচয়। আসল পরিচয় সে এদেশেরই মানুষ। কিন্তু দেশের হিন্দু বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এ পরিচয়ে নিজেদের ভাবতে পারছেন কি? শঙ্কা-নিরাপত্তাহীনতায়-অপমানে নিজের অস্তিত্বই অনুভব করতে পারছেন না। যারা এত নিপীড়ন সত্ত্বেও বিএনপি-জামায়াত থেকে আওয়ামীলীগকে মন্দের ভাল হিসেবে নির্ভরযোগ্য মনে করছেন, তারা চরিত্রগতভাবে কতটুকু তফাৎ খুঁজে পাচ্ছেন? এভাবে ৪৫ বছর তো পার হলো! আজ হামলা কেবল হিন্দুদের ওপর নয়, অন্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়– শিয়া, সাঁওতাল, পাহাড়ী কেউ কি আক্রমণের বাইরে আছেন? প্রতিদিনই কত অবর্ণনীয় নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছেন এদেশের নারীরা। মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর কর্তৃত্বে থাকা এ রাষ্ট্রে/সমাজে দুর্বল, অসংগঠিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পদে পদেই আক্রমণের শিকার। ক্ষমতাশালী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কর্তৃক জায়গা-জমি দখল, নদী দখল, খাস জমি দখল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুট কি না হচ্ছে। কিন্তু নিপীড়িতের পক্ষে দাঁড়ায় কে? খেয়াল করলে দেখা যাবে নাসিরনগর বা সাঁওতাল পল্লীতে ক্ষমতাশালীরা আক্রমণ করেছে কিন্তু নিপীড়িত মানুষদের আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচানোর চেষ্টা করেছে সাধারণ মানুষ। প্রতিরোধের শক্তি নিহিত এখানেই। কেবল হিন্দু জনগোষ্ঠীর বা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ঐক্য সাধনের মধ্য দিয়ে এর সমাধান হবে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথপরিক্রমায় বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের পথেই কেবল এর অবসান হতে পারে।

সারাদেশে মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষের সূচনা ও বাসদ(মার্কসবাদী)-র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চট্টগ্রাম

গত ১৮ নভেম্বর বিকাল ৩ টায় নগরীর বটতলী রেলস্টেশন চত্বরে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মানস নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। সভা পরিচালনা করেন জেলা শাখার সদস্য সচিব কমরেড অপু দাশগুপ্ত। কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এতোবড় সংগ্রামের পরও কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। বরং ৪৫ বছরে এক দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী হয়েছে, যেখানে লুটপাট দুর্নীতি প্রথম ও শেষ কথা। শাসক দলগুলো ক্ষমতার স্বার্থে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাথে আপোষ সমযোতার মাধ্যমে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার এমন এক পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সম্প্রীতি হারিয়ে যাচ্ছে। বাক্ষণবাড়িয়ায় সম্প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনায় স্পষ্টভাবেই বোধ্যগম্য সরকার দলীয় এমপি ও প্রশাসনের ছত্রছায়াতেই এধরনের ঘটনা ঘটতে পেরেছে। এর আগেও সাম্প্রদায়িক সমস্ত ঘটনায় সরকারি মদদ ছিল। গণতন্ত্র মানে তো জনগণের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকা। কিন্তু আওয়ামী-মহাজোট শাসনে এসব আজ কথার কথা। তা নইলে রামপালে সুন্দরবন বিনাশী বিদ্যুৎপ্রকল্পের বিরুদ্ধে যেখানে গোটা দেশ সোচ্চার, সরকার উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে গায়ের জোরে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছে। জনবিরোধী এ সকল চক্রান্ত রুখে দাঁড়ানোর জন্য জনগণের সচেতন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম আজ সময়ের দাবি।" জনসভার শুরুতে লাল পতাকায় সুসজ্জিত র‍্যালী ও শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালনায় নাটক 'মৃত্যুখেলা' পরিবেশিত হয়।

চট্টগ্রামে বক্তব্য রাখছেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

নোয়াখালী

নোয়াখালী জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় মাইজদী শহরের প্রধান সড়কে ব্যানার ফেস্টুনে দাবি সম্বলিত লাল পতাকায় সজ্জিত মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল পরবর্তী সময়ে নোয়াখালী টাউন হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জেলা শাখার আহবায়ক কমরেড দলিলের রহমান দুলালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, মোবারক করিম। সভা পরিচালনা করেন জেলা পার্টির সংগঠক বিটুল তালুকদার।

আরো খবর ভেতরের পাতায়

পুলিশের হাতে শিক্ষক হত্যা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শেষ কোথায়?

সম্প্রতি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজকে জাতীয়করণের দাবিতে চলমান আন্দোলনে পুলিশের লাঠিপেঠা ও গুলিতে শিক্ষক ও এক পথচারী নিহত হয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে সাংসদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছনার দগদগে স্মৃতি এখনো ভুলতে পারেনি দেশের মানুষ। সেই স্মৃতি অপসৃত হওয়ার আগেই এবার খোদ রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর হাতে নিহত হল এক শিক্ষকসহ দু'জন ব্যক্তি। রাষ্ট্রের কাছে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির এই হল পুরস্কার! সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা স্বচ্ছল জীবনের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও যে শিক্ষকেরা মানুষ গড়ে তোলার দায়িত্ব কাধেঁ নিয়েছেন এই হল তাদের পাওনা! ছাত্র ও শিক্ষকদের ন্যায্য আন্দোলনে পুলিশকে লেলিয়ে দেয়া- সরকারের ফ্যাসিবাদী রূপেরই বহিঃপ্রকাশ। সরকারের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে অনার্স পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষাদানের কথা থাকলেও শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের প্রধান ধারাই বহাল আছে। সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের নজিরবিহীন দুর্নীতি আর প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের কারণেই আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ গুলি করে মানুষ হত্যা করছে। পুলিশি হামলায় আন্দোলনরত একজন শিক্ষক নিহত, সাধারণ মানুষসহ অসংখ্য আহত হওয়ার পরও পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাত ৩০০/৪০০ জনকে আসামি করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

বাস্তব ঘটনা হলো, সরকার ২৩টি কলেজকে জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করে। এর মধ্যে সব দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা ফুলবাড়িয়া কলেজকে বাদ দিয়ে এমপিওবিহীন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজকে (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ফুলবাড়িয়া কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ও এলাকার মানুষ বলছেন, সব দিক দিয়েই ফুলবাড়িয়া কলেজটি এগিয়ে থাকলেও তুলনামূলকভাবে সব দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকা কলেজকে জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। এ নিয়ে তাঁরা প্রায় দেড় মাস ধরে আন্দোলন করছেন। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত ফুলবাড়িয়া কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩০০ এবং এখানে সাতটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হয়। অন্যদিকে বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০। ১৯৯৯ সালে কলেজটি সাংসদ মোসলেম উদ্দিনের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। ২০০৯ সালে কলেজটির নাম পাল্টে রাখা হয় বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজ। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সাংসদের কারণেই ফুলবাড়িয়া কলেজটি জাতীয়করণ হয়নি। এই অভিযোগে আন্দোলনকারীরা দেড় মাস ধরে আন্দোলন করছে। প্রভাবশালী এই গোষ্ঠীর স্বার্থে আন্দোলনকে নস্যাৎ করতেই এই হত্যা হামলা ও গুলি চালানো হয়েছে।

প্রতিবাদের ছবি দেখুন পৃষ্ঠায় ৪-এ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতীকী গণভোট
৯০শতাংশ ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চায় না

ভোটের বাক্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে বিভাগে ঢুঁ দিচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে। কখনও করিডোরে আড্ডারত ছাত্রছাত্রীদের পাশে গিয়ে, কখনও ক্লাস শুরুর মূহুর্তে স্যারের কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়ে ভোট চাইছে তারা। কখনওবা দৌঁড়াচ্ছে শিক্ষকদের কমনরুমে, কখনও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টেবিলে টেবিলে। তাদের লক্ষ্য একটাই- যত বেশি ভোট সংগ্রহ করা যায়, অর্থাৎ যত বেশি মত সংগ্রহ করা যায়।

কিসের জন্য এই মতামত সংগ্রহ? সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে প্রতীকী গণভোটের আয়োজন করা হয়েছিলো। কারণ সুন্দরবনের কোল ঘেষে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপক্ষে সারাদেশের বিবেকসম্পন্ন মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠছে। এর বিরুদ্ধে সরব গোটা দেশ। অথচ সরকার বলছেন, আন্দোলন নাকি কতিপয় লোক করছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে তাই এই সংগঠন গণভোটের মাধ্যমে ব্যাপক মানুষের মত নিয়ে দেখতে চাইছিলো এবং দেখাতে চাইছিলো বাস্তব অবস্থাটা কী?

গত ৩০ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত চলে এ ভোট গ্রহণ। ১৭ নভেম্বর ঐতিহাসিক বটতলায় তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ গণভোটের রায় ঘোষণা করেন। মোট ভোট পড়েছিলো ১০,১১১টি। এর মধ্যে ৯,১৪৮টি ভোট অথর্ৎ ৯০.৪৮% শতাংশ ভোট পড়েছে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিপক্ষে আর মাত্র ৮৬০ টি ভোট অর্থাৎ ৮.৫১ % ভোট রামপালের পক্ষে। ১০৩ টি ভোট অর্থাৎ ১.০১% ভোট বাতিল হয়েছে।

ভোট সংগ্রহ করতে গিয়ে কেমন দেখলেন? মানুষ কী বলে? বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীরা শোনালেন নিজেদের নানা উৎসাহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার কথা। প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেছেন, "আমাদের গোটা ডিপার্টমেন্টেরই তো এই বিষয়ে রাস্তায় নামা উচিত। অন্য *(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org। ই-মেইল : mail@spbm.org